গঙ্গামাঝি
কবি চক্রবর্তী

দু-কুল ছাপিয়ে তির বেগে ছুটে চলেছে আত্রাই। এমন সময় আত্রাই –এর রূপ যেমনই ভয়ংকরী, তেমনই আবার মোহিনী রূপের যাদুকরী। রূপ ছটায় দৃষ্টি স্থির। নিষ্পলক। যারা আত্রাই-এর জল ছুঁয়ে বড় হয়েছে তারা ভাগ্যবান।

ছুটে চলা জল মাঝে ক্ষণে ক্ষণে পাক খাচ্ছে ঘুর্ণি। নাচছে সফেন ঢেউ। কচুরি পানার ওড়না উড়িয়ে ঘুরছে। তলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠছে দূরে। তোড়ে ছুটছে জল।

ঘাট পাড়ের একদিকে সাহেবগঞ্জ, একদিকে ফকিরগঞ্জ। বর্ষায় এক ঘাট বিস্তার নিয়ে শুয়ে থাকে। যাত্রী পারাপারে বিশাল সাইজের নৌকাগুলি ভাসে। একটা খেয়া কোনো ভাবে ধরতে না পারলে পাক্কা একঘন্টা। ঘাটোয়াল বিহার মুলুকের বাসিন্দা মাঝিরাও ওই দেশীয়।

কবে কার হাত ধরে এসেছিল গঙ্গা মাঝি। গঙ্গাধর মাল্লা। সংক্ষেপে কেমন করে গঙ্গা মাঝি হয়ে যায়। টানটান শরীরী গঠন। দেখলে বোঝা যায় গৌরবরণ রোদে পুড়ে জলে ভিজে তামাটে। ক্রমাগত লগি ধরে নৌকা ঠেলায় শক্ত কড়াপড়া হাত। তাগড়া গোঁফ। মুখ মন্ডলের তুলনায় একটু বে-মানান। পরনে ধুতি মালকোচা মারা। কোমরে- গামছা কষে বাঁধা। গায়ে হাতাওলা গেঞ্জি।

এ ঘাট পাড়ের বৈশিষ্ট্য অপরিমিত যাত্রী পারাপার। বিশেষ ভাবে স্কুল শুরু এবং ছুটি আর সপ্তাহে দুটি হাটবার। মঙ্গলবার ও শুক্রবার। এ দু-দিন ভয়ংকর পরিস্থিতি ছুটির সময়। হাট যাত্রীর তাড়া বেলা বয়ে যায়। ওদিকে আকাশে গড়াতেই হাট যাত্রীরা জমায়েত ঘাট পাড়ে। সুতরাং নৌকা ঘাটে ভিড়তেই লাফালাফি, এক চাকা নৌকায় তো আন্যটি ঝুলছে। চিৎকার চেঁচামেচি।

হঠাৎ হৈ হল্লার মাঝে একটি কন্ঠস্বর সব ছাপিয়ে উর্ধ্বমুখী- আরে, এ নুনিয়ে- শালা বুরবাক্ খোল দে রস্সা।

নুনিয়া বাঁধন খুলেই উঠে পড়ে নৌকায়। হাতে ধরা লাগিতে ধাক্কা দিতেই নৌকা পাড় থেকে দূরে সরে।

বিশাল মাপের নৌকাটির চালক এই মুহূর্তে গঙ্গা মাঝি। একটু বেগড়বাই করলেই হুংকার। ধীরে লয়ে ভাসছে নৌকা। এগোচ্ছে। মাত্র চার আঙুল জলের ওপরে, বাকি অংশ জলের নীচে। ভরা নদী বেয়ে এগোচ্ছে নৌকা। এসময় একবার পার হতে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। বিপরীতে হাওয়া থাকলেতো কথাই নেই। উজান বেয়ে নৌকা এগিয়ে –এবার ভাটির টানে ছেড়ে হালকা বৈঠা মারা। অপর পাড়ে ভিড়বার মুখে গভীরতা তলহীন। এখানে লগির কোন কাজ নেই। সবটাই বৈঠার কেরামতি। গহীন জলের পাকে পড়ে নৌকা কখনো ছিঁড়ে বেড়িয়ে যেতে

চায়। কিন্তু কেমন আলতো সেই ঘুর্ণি পেরিয়ে নৌকা পাড়ে লাগতেই গঙ্গা হাঁকে –এ নুনিয়া খুঁটি ধর। লাগাপ্যাঁচ। কেই লামভেন না। ধীরে সে।

বলতে না বলতেই কেউ একজন নেমে যায়। ব্যাস নৌকা কাত। ঝলক দিয়ে জল ওঠে। চিৎকার চেঁচামেচি। সঙ্গে সঙ্গে বাক্যবাণ উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য–এ কোন বরুবাক আদমি। এতো কোরে বললাম। শালো র মানছে না। আরে বাবা নৌকা ধরনে তো দিজিয়ে।

আশ্বিন–কার্তিক মাস। নিম্নচাপ। কদিন ধরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। সাথে জোর হাওয়া। নৌকা একহাত এগোলে–দু–হাত পিছিয়ে যায়। এ সময় অন্য মাঝিরা সাহস পায় না নৌকা ছাড়তে। কিন্তু বহু মানুষের জরুরী কাজ থাকে। এমতাবস্থায় গঙ্গা মাঝিই একমাত্র ত্রাণ কর্তা। ঝড়–বৃষ্টি, রাত–বিরেতের উদ্ধার কর্তা। এই সময় নদী রীতিমত ভয়ংকরী। আবার বন্যা নেমে গেলেই নদী তখন শান্ত।

সময়টা সত্তরের দশক। ঘাট পেরিয়ে বেশ কয়েকজন বালুরঘাটে যায় নাইট কলেজ করতে। তখন কমার্স নিয়ে পড়তে হলে রাতেই পড়তে হতো। ক্লাস শেষ করে ফিরতে সাড়ে নটা–দশটা বাজতে। নদী ছোট থাকলে সমস্যা নেই। সমস্যা বন্যার সময়। সাহেবগঞ্জ ঘাটপাড়ে প্রায় দিনই নৌকা থাকত না। লাস্ট ট্রিপ নিয়ে নটায় ফিরে আসত নৌকা। ভরা নদী। আন্ধকার রাত। অন্য কেউ সাহস পেতো না। সুতরাং গঙ্গা মাঝি ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ড়াকবে কে? এখনই শুরু হবে খিস্তি খেউর। কোনো রকমে সাহসে ভর দিয়ে ডাকে –হে – এ – এ –এই—

জলের বুকে সাঁতরে সে হাঁক ভাসে। একবার। দুবার। সাড়া নেই। উপায়ান্তর না দেখে এবারে সমবেত হাঁক। কয়েকটি স্বরের কনসার্টে কেউ হ্যারিকেন নিয়ে বেরোয়।

–গঙ্গা ভাই – এই গঙ্গা ভা–আ–আ–ই–

– কোন হ্যায়।

কন্ঠস্বরে জোশ এনে বলে – আমরা গঙ্গা ভাই–

– তো হাঁ, কালিজ বালা।

লন্ঠনটাকে ঘাটের বাঁশে ঝুলিয়ে রাখে। লালচে আলোর ছায়া অন্ধকারের বুকে চিরে ছড়ায়। আলোর ক্ষীণ রেখার পথ ধরে একটা অবয়ব নীচে নামে। লগি ঘষা খায় নৌকা ছেড়েছে। এতক্ষণে খানিক স্বস্তি।

ঘন অন্ধকার। বিশ্বচরাচরে কারা যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। নির্মেঘ আকাশে তারাদের সভা। নৌকার কোন সাড়া শব্দ নেই। ঘাট পাড়ের বাঁশ ঝাড়ের মাথায় রাতচরা পাখির ডানা ঝাপটানি। মাঝে মাঝে জল ঘুর্ণির কলকল শব্দ।

অবশেষে অপেক্ষার সমাপ্তি। এক কালো ছায়া ঘাটে ফরাসের গায়ে লাগে। যাত্রীরা সাইকেল নিয়ে নীচে নেমে ফরাস ডিঙিয়ে নৌকায় উঠতেই বাক্যবাণ ছুটে আসে–হাঁ, আমিন বাবুকা বেটা। আউর কোন? ঠাকুর বাবা। আচ্ছা, হোয়ে গেল টাঙ্কি মারা?

–গঙ্গা ভাই, কলেজ ছুটি হতে আজ দেরি দিল।

–হাঁ হাঁ কল্যাণী সিনেমা হলমে কেলাস বহুত হোতা না।

কিছুতেই সে বুঝতে চায় না, কলেজ থেকে ক্লাস শেষ করে ফিরছে। নৌকা ছাড়ার মুহূর্তে শেষ খেয়ার হাঁক দিতে ভুল করে না গঙ্গা– হে –এ–এ–ই—

অন্ধকারে ধাক্কা খেতে খেতে সে হাঁক ছুটে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বন্যা সরে যেতেই– সে আর এক দিগদারি। মাঝে জেগে ওঠে চরা। তখন ঘাটপাড় থেকে অনেকটা ভাটিতে গিয়ে অস্থায়ী ঘাট তৈরী হয়।

দিন কয়েক হল নিম্নচাপের প্রভাবে ঝোড়ো বাতাস। দোহার হিসাবে মেঘে ঢাকা আকাশ। ভেঙে নামে বৃষ্টি ধারা। নৌকার চালক আজ তিন জন। বৈঠা চেপে গঙ্গা মাঝি। লগা নিয়ে দু–ধার থেকে দু–জন। নৌকায় খুবব একটা ভিড় নেই। স্কুল ফেরতা মাষ্টার মশাইরা, জন কয়েক সাধারণ যাত্রী। বৃষ্টির কারণে ছাতা নিয়ে কেউ বসতে পারছে না। পারাপারের অসুবিধার জন্য স্কুল আগেই ছুটি হয়েছে। বেলা তিনটা প্রায়।

গঙ্গার মাথায় মাথোল। সর্বাঙ্গ পলিথিন জড়িয়ে বাঁধা। নৌকা বাতাসের চাপে নড়ে না। বৈঠা বগলে ও হাতে চেপে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গঙ্গার পরামর্শ – বইঠে যান মাস্টার বাবুরা। অগত্যা বসতে হয়।

বহু কসরতের পর নৌকা অপর পাড়ে ভিড়তে সামান্য বাকি। আর একটু। হঠাৎ এক দমকা ঝাপটা। এক ঝটকায় নৌকা পূর্বস্থলে। বার তিনেক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে যারা কাজ নিয়ে শহরে যাচ্ছিল, মাষ্টার মশাইরা ছাড়া সকলে নেমে গেলো। কেন না ঘড়িতে তখন পাঁচটা।

যে আত্রাই তার ভয়ংকরী রূপ নিয়ে – শত হুংকারেও গঙ্গা মাঝিকে ডরাতে পারে না। নেহাতই বালিকা হয়ে যেন চকলেটের লোভে ঘুরঘুর কররে – সেই শুকনো নদীর কাছেই গঙ্গা নাজেহাল হয়ে হার মানে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চতুর্থবারে নৌকা অবশিষ্ট যাত্রী নিয়ে ঘাটে ভেড়ে।

এভাবেই গঙ্গা মাঝির জীবনের ওপর দিয়ে এমন কত বর্ষা যায়–শরৎ যায়–আসে হেমন্ত। হেমন্তের প্রোক্কালে পৃথুলা আত্রাই কিশোরী হলে তার বুকের ওপর বাঁধা হয় সাঁকো। সাঁকো তৈরীতেও ওস্তাদ গঙ্গা মাঝি। সাঁকো হয়ে গেলে নৌকা গুলি জলে ডোবানো হয়।

ঘাটের কাজ বন্ধ। দীর্ঘ সময় বাংলার জলহাওয়ায় ঘর সংসার খেতি বাড়িতে দিন কাটে। সংসারের কাজ কর্মের ফাঁকে না সামাজিক অনুষ্ঠানে পাচক ঠাকুরের সহায়ক হিসাবে বাকি সময়ের কাজ। মশলা পেষা, জল বহন। অযথা বসে থেকে অলস দিন যাপন গঙ্গা মাঝির হিসেব খাতায় নেই।